১৯২৮ থেকে ১৯৪২
সাধক নজরুল

১৯২৮-১৯৪২, ১৪ বছর সাধক নজরুলের সময়টা কেমন ছিল? বিস্ময়কর সাধক নজরুল দু'হাতে লিখছেন গান, কবিতা। নিউ থিয়েটার্সের ফ্লোরে নারদ সেজে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন। সুর দিচ্ছেন। ১৯২৮ সালে 'পথের প্যাঁচালী' বেরিয়েছে। ১৯৩১-এ দিলীপ রায় তার গান গাইছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেন সভাপতি। অ্যালবার্ট হলে সুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনা। গান গাইছেন সাধক নজরুল। তারাশঙ্করের লাভপুরে সাধক নজরুল বেড়াতে গেছেন। 'দেবদাস' সিনেমায় সায়গলের কণ্ঠে তাঁর গান-গোলাপ হয়ে ফুটুক। চিৎপুরে বিষ্ণুভবনে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সালে কানানবালা ছুটে যাচ্ছেন তাঁর কাছে, যদি একটা ভাল গান পাওয়া যায়। মহামেডান স্পোর্টিং লিগ ও শিল্ড, দুই-ই জয় করেছে। সাধক নজরুলের বড় ছেলে বুলবুল মারা গেছে। 'শূন্য এ বুকে' গান গাইছেন জ্ঞান গোঁসাই। তাঁর সাহিত্যজীবন মোটামুটি বাইশ বছর, মাত্র। তার মধ্যেই কী বিপুল বিচিত্র ক্ষমতায় লিখেছেন গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিত্রনাট্য, সুর দিয়েছেন, অভিনয় করেছেন, সঙ্গে রাজনীতিও। ১৯২৬, সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হন। মে মাসে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন হবে ঠিক হয়েছিল। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলনও হতে যাচ্ছিল। সাধক নজরুলের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। ইতোমধ্যে এপ্রিল মাসে শুরু হয়ে গেল কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। কলকাতার সঙ্গে তাঁর নিত্য যোগাযোগ।

এই দাঙ্গা তাঁকে বিচলিত করে তুলল। তাঁর তখনকার লেখা থেকে তা বোঝা যায়। সামপ্রদায়িকতার সেই বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে কৃষ্ণনগরে সম্মেলনের প্রস্তুতিও চলছিল। তাঁর দিনগুলি তখন তুমুল ব্যস্ততাময়। এতটুকু অবকাশ নেই তাঁর। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তোলা থেকে অন্য অনেক কাজও তাঁকে করতে হচ্ছিল, এমন-কি সেই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত পর্যন্ত রচনা, সুর দেয়া, গাওয়াও।

দৌলতপুর যাওয়ার পথে কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর পরিবারের সঙ্গে সাধক নজরুলের পরিচয় হল। ছিলেন গিরিবালা, বিধবা। সঙ্গে তার একমাত্র মেয়ে আশালতা। পরে কয়েকবার তিনি ওই বাড়িতে গেছেন, থেকেছেন। আশালতার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। তিন বছর পর বিয়ে। আশালতা হলেন প্রমীলা।

এই সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে সাধক নজরুলের কতখানি নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল বিয়ের আগেই, তার একটি নজির আছে। গৃহকর্ত্রী বিরজাসুন্দরীকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন। কারাদণ্ডের সময় তিনি যখন অনশন শুরু করেন তখন সেই অনশন ভাঙার জন্য বন্ধু-বান্ধবেরা তো বটেই, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সমেত অনেকেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন (সেই টেলিগ্রাম অবশ্য পৌঁছায়নি, তবে সাধক নজরুলকে উৎসর্গ-করা রবীন্দ্রনাথের নাটক 'বসন্ত'র কবি-স্বাক্ষরিত কপি পৌঁছেছিল), কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেননি। মা দেখা করতে গেলেও দেখা করেননি। কুমিল্লা থেকে বিরজাসুন্দরী দেবী এসে হুগলি জেলে তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি তার হাত থেকে লেবুর রস খেয়ে অনশন ভাঙতে রাজি হন।

'জেল থেকে বেরিয়ে পাঁচ মাস পরে প্রমীলার সঙ্গে তরুণ সাধক নজরুলের বিবাহ হল। এর মধ্যে একটি খুবই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। তখন আর শুধু তরুণ সাধক নন, কবি নন, উদ্দাম গায়ক, সুপুঁরুষ যুবা, মহিলামহলে খুবই জনপ্রিয়। মেদিনীপুরের মহিলারা ওই তরুণ সাধক নজরুলকে আলাদাভাবে সংবর্ধনা জানাতে চান। সেই সভায় তাঁর গানের সময় আবেগের আতিশয্যে একটি তরুণী মঞ্চে উঠে এসে তাঁর গলায় নিজের সোনার হারটি পরিয়ে দেন। হিন্দু তরণীটির ওই রকম ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া

হয়েছিল সাংঘাতিক, তার ওপর অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটি নাইট্রিক অ্যাসিড পান করে আত্মহত্যা করেন।' (নলিনীকান্ত সরকারের স্মৃতিকথা)।

প্রসঙ্গক্রমে, সাধক নজরুলের জীবনে দু'টি অমীমাংসিত প্রশ্নেরও উল্লেখ করা যায় এখানে। জেলে তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাননি। এবং আর কোনওদিনই মায়ের সঙ্গে দেখা করেননি। কিন্তু মায়ের প্রতি কেন এই অভিমান। সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, 'পিতৃবিয়োগের পর জননী আবার বিয়ে করেছিলেন, সেটা মেনে নিতে পারেননি কবি।' মুসলমান সমাজে এরকম বিধবা বিবাহ যদিও খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। করাচি থেকে ফিরে সাধক নজরুল একবার গিয়েছিলেন চুরুলিয়ায়, কিছু একটা হয়তো ঘটেছিল সেখানে, জীবনে আর কখনও সে-গ্রামে তিনি ফিরে যাননি। জন্মস্থানের প্রতি এই বিরক্তির কারণটাও জানা যায় না। সাধক নজরুলের সাধনার জীবনে যা ঘটেছে সব কিছুই দ্রুত, ঘটনাবহুল এবং নাটকীয়। তিরিশ বছর বয়সে অ্যালবার্ট হলে এক বিশাল জনসভায় সংবর্ধনা জানানো হয় যুবক সাধক নজরুলকে। সেই সভার সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মানপত্র পাঠ করেন এস ওয়াজেদ আলি, উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বক্তৃতা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। এত কম বয়সে এমন সম্মান আর কোন তরুণ সাধক সাধনার জীবনে কবি হিসেবে পেয়েছেন?
'ধূমকেতু' পত্রিকায় লিখতে লিখতেই তাঁর খ্যাতি প্রথম ছড়ায়। 'ধূমকেতু' নামে কবিতাও লিখেছেন। ধূমকেতু শব্দটি তাঁর প্রিয় ছিল, নিজেকে ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা দিতে ভালবাসতেন। সাধনার জগতে পা দিয়েই নজরুল নিজে জানতেনই লেখালেখির জগৎ থেকে তাঁকে ধূমকেতুর মতোই বিদায় নিতে হবে। ১৯২৯ সালে আজিজুল হাকিমকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মতো, হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশিদিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে, তেমনি সহসা চলে যায়।'

গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেয়ার পরে তিনি রূপ পরিবর্তন করে হয়ে ওঠেন প্রধানত গীতিকার ও সুরকার।
রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে যত গান লিখেছেন, সাধক নজরুল মাত্র দশ-বারো বছরের মধ্যে গান বেঁধেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। তার গানের সংখ্যা তিন হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে অন্তত ৩০০ গান তো বাঙালি যত দিন আছে তত দিন শুনবে। তরুণ সাধক সাধনার পথে চরম দারিদ্র সহ্য করেছেন, গীতিকার হিসেবে সচ্ছলতা ভোগ করতে পেরেছেন কিছুদিন। এক সময় তিনি মস্ত বড় একটা গাড়ি কিনেছিলেন এবং তার বাড়ি পাহারা দিত নেপালি দারোয়ান। কিন্তু স্বভাবে বেহিসেবি ও অমিতব্যয়ী ছিলেন বলে সে-সম্পদ বেশিদিন রাখতে পারেননি কারণ সম্পদতো বেঁধে রাখতে পারে না। চরম অসুস্থ হওয়ার অনেক আগেই তিনি কবিতা লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, কখনও লিখেও ছিড়ে ফেলেছেন। ১৯৩৬-এ জসিমউদ্দিনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি সাহিত্য-লোক হতে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছি।' গোপন রেখে দিলেন তাঁর সাধনার জীবন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'নজরুল সেই বিরল অসামান্যদের একজন, যাদের ঠিক একটা ছাপা চেহারায় চেনা যায় না।' এরকম কথা আরও অনেকে বলেছেন, যারা ব্যক্তি নজরুলকে কাছ থেকে দেখেছেন তার প্রথম জীবনে, তার সেই প্রাণোচ্ছলতা, ঝোড়ো হাওয়ার মতো জীবনযাপন, তা যেন ঠিক লিখে বোঝানো যায় না। সাধক নজরুলের রচনাগুলিও ছাপার অক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকার মতো নয়। কবিতা পাঠ্য না শ্রাব্য, এই নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে স্বীকার করে নেয়া ভাল, সাধক নজরুলের গানগুলি তো বটেই, তার কবিতাগুলিরও পড়ার চেয়ে শুনতে বেশি ভাল লাগে। উপযুক্ত আবৃত্তিকারের কণ্ঠে তাঁর বহুবার-পড়া কবিতাও নতুন করে রোমাঞ্চজাগায়। সেই সব কবিতার আবেগ জনমনে ছড়িয়ে যায়, এমন-কি যারা নিরক্ষর, তাদেরও এই কবিতার রসগ্রহণে অসুবিধে হয় না।
অন্নদাশঙ্কর রায় এর চোখে ব্যক্তি নজরুলের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর একটি ছোট্ট ছড়া লিখেছিলেন নজরুলকে নিয়ে:
ভুল হয়ে গিয়েছে বিলকুল..সব কিছু ভাগ হয়েছে।
ভাগ হয়নিকো নজরুল..এই ভুলটুকু বেঁচে থাক।। বাঙালি বলতে একজন আছে। দুর্গতি তার ঘুঁচে যাক।
সেই বিরল ব্যতিক্রমী বাঙালির প্রধান দৃষ্টান্ত সাধক নজরুলের বহুরূপ। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে ছিল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এক ঝলক আগুন আর আত্মবিশ্বাস। তাঁর রাগিয়ে-দেয়া, জাগিয়ে-দেয়া গান, কবিতা কখনও ডাক দিয়েছে সাম্যবাদী চেতনাকে, কখনও বাঙালির বিপ্লবকে। বলছেন ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ। অথবা গাইছেন, চল,

চল, চল। এই আধুনিকতায় ধুলো পড়েনি। বক্তব্যেও নয়। ইনি সেই সাধক, যিনি গড়ার জন্যই ভাঙতে চান। তাই তাঁর এই একশো দশ বছরেও বাঙালির হাজারটা দগদগে ব্যথার মধ্যে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না সাধক নজরুল ইসলামকে বিভিন্নরূপে।